Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 452 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 452 – 456
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির ত্রাস : রাঁঢ় ত্রৈলোক্যতারিণী

নার্জিয়া পারভীন
Email ID : narziaparvin1997@gmail.com

Received Date 16. 06. 2024
Selection Date 20. 07. 2024

Keyword
Serial killer, prostitute, the world of crime, nineteenth century, troilokyatarin.

Abstract
The story of a daughter of a noble family of a remote village in Burdwan district who becomes a murderer. Her name is Trailokyatarini. The girl who caused a panic among the people of nineteenth century Calcutta. A woman who was murdering consecutively like a professional murderer, only in the lure of jewelry. Murder in lure of jewelry may be for the first time of Indian history. It was very surprising that in the nineteenth century Bengal amongst the reader of Bomkesh and Feluda there could be a serial killer. When we think about the serial killer, the first name that comes in our head is Jack the Ripper, an English professional killer. The terror of nineteenth century, who was in the apex of brutality by taking away homebody's uterus, someone's kidney after murdering. But if we look at the nineteenth century Bengal except London, we can see that eight years ago Barangana came in front of us, the first female in the history of Indian serial killer. To catch her, the police of that time had to do a lot of digging. Who killed continuously in the list of jewelry and money. To satisfy her own greed she makes herself engage in many criminal activities. As a result of this in 1884, 3rd September she was sentenced to be hanged.

Discussion

১৮৮৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, ত্রৈলোক্য নাম্নী পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্কা এক বারাঙ্গনার ফাঁসির হুকুম হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই একই বছরের ৯ই আগস্ট পাঁচু ধোপানী গলির বাড়িতে বসবাসকারী রাজকুমারী নামের এক বেশ্যাকে খুন। যদিও রাজকুমারীকে হত্যাই তার প্রথম অপরাধ নয়, এর আগেও সে পাঁচ-পাঁচটা বারাঙ্গনাকে ডুবিয়ে হত্যা করেছিল। প্রমাণের অভাবে ও পুলিশের খানিকটা অবহেলার কারণেও বারবার সে রক্ষা পেয়েছে শাস্তি থেকে। যত রক্ষা পেয়েছে তত সাহস বেড়েছে। ততই তার অপরাধধ জগতের রাস্তাটা মজবুত হয়েছে। উনিশ শতকে একের পর এক হত্যা করে প্রথম মহিলা পেশাদারি খুনির তকমা পেয়েছিল এই ত্রৈলোক্য নামের বারাঙ্গনা। উনিশ শতকের বাংলা ত্রাস, প্রথম বাঙালি পেশাদারি খুনি ত্রৈলোক্যতারিণী।

সিরিয়াল কিলারের কথা ভাবলেই আমাদের মাথায় প্রথম নাম আসে 'জ্যাক দি রিপার' এর কথা, একজন ইংরেজ পেশাদারি খুনি, উনিশ শতকের লন্ডনের ত্রাস। যে খুন করে মৃতদেহের পেট চিরে কারও জরায়ু, কারও কিডনি বের করে নেওয়ার নৃশংসতার শীর্ষে উঠেছিল। কিন্তু লন্ডন ছেড়ে উনিশ শতকের বাংলায় নজর ফেরালে আমরা দেখতে পাব, জ্যাক দি রিপারের আট বছর আগেই এক গণিকার নাম উঠে আসে বাংলা তথা ভারতের প্রথম মহিলা পেশাদারি খুনি হিসাবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 452 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বর্ধমানের ছোট এক গ্রামের কুলীন বংশের বিধবা মেয়ে থেকে বারাঙ্গনা; বারাঙ্গনা থেকে ভারতের প্রথম মহিলা পেশাদারি খুনি। গয়নার লোভে একের পর এক খুন করে গেছে ত্রৈলোক্য নামের এই পতিতা। শুধুমাত্র খুন নয়; খুনের পাশাপাশি সিদ্ধ হস্ত ছিল অন্য সমস্ত অপরাধেও। কেবল উনিশ শতকের মহিলা অপরাধী বললে ভুল হবে, আসলে সেই সময়ের অপরাধ জগতের শীর্ষে তার নাম। এই ত্রৈলোক্য নামের অপরাধীর কথা হয়তো মানুষ জানতে পারত না, ইতিহাসের অন্য জিনিসের মতোই হয়তো হারিয়ে যেত তার নাম। যদি না দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় অবসরের পর লেখালেখির কাজে হাত দিতেন। আমরা প্রাথমিকভাবে ত্রৈলোক্যর জীবনের লোমহর্ষক কাহিনি সম্বন্ধে জানতে পেরেছি তাঁর 'দারোগা দপ্তর' নামক গ্রন্থ থেকেই। যেখানে তিনি তার জীবনে সমাধান করা কেসগুলিকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। 'দারোগার দপ্তর' নামক গ্রন্থে প্রিয়নাথ লিখেছেন, ত্রৈলোক্যর ফাঁসি হওয়ার পূর্বে জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেছিলেন। ত্রৈলোক্য দারোগা প্রিয়নাথকে তার জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে থাকে। বাল্য জীবন থেকে শুরু করে পতিতা জীবনের প্রবেশ এবং অপরাধ জগতের বিস্তারিত বর্ণনা ত্রৈলোক্য নিজের মুখেই দারোগাকে জানিয়েছিল। দারোগা প্রিয়নাথ ও রাঁড় ত্রৈলোক্যর কথোপকথনের মধ্যেই ত্রৈলোক্যের জীবনকথা আমাদের সামনে উঠে আসে।

সংস্কারের আলো তখন ছুঁয়ে যায়নি গ্রাম্য সমাজকে। তখনও কুসংস্কারে ঠাসা গ্রাম বাংলা। উনিশ শতকের মাঝের দশকে বর্ধমান জেলার প্রত্যন্ত এক গ্রামে জন্ম ত্রৈলোক্যতারিণীর। কুলীন বংশের কন্যা হওয়ার কারণে বিভিন্ন কুপ্রথার শিকার হতে হয়েছিল তাকে। এক. বাল্যবিবাহ, মাত্র তেরো বছর বয়সে তার বিবাহ হয়। দুই. কৌলিন্য প্রথা, কুলীন বংশের কন্যা হওয়ার কারণে এক বৃদ্ধ কুলীনের সাথে বিবাহ হয়েছিল তারিণীর। যেখানে মনের মিলনের কোনও কথা থাকে না শুধুমাত্র কথা ছিল দেনা পাওনার। বিয়ের পর বিভিন্ন পাওনা বুঝে নিয়ে বৃদ্ধ জামাইবাবা বাড়ির পথে রওনা হয়। উনিশ শতকের বেশিরভাগ মেয়ের মতোই বিয়ের পর ত্রৈলোক্য বাপের বাড়িতেই থাকে। সংসার তাকে করতে হয়নি। স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শুধু দু'বার তার সাথে তার স্বামীর সাক্ষাৎ হয়। বিয়ের চার বছর পর ত্রৈলোক্যর বৃদ্ধ স্বামী যখন তাদের বাড়িতে আসে তখন বৃদ্ধ স্বামীর সাথে সহবাসের আতঙ্কে প্রতিবেশী তারা বৈষ্ণবীর গৃহে দিন কাটায় ত্রৈলোক্য। উনিশ শতকের সমাজে নজর রাখলে আমরা দেখতে পাব, এই ভয় শুধু ত্রৈলোক্যের একার নয়। কুলীন বংশের বেশিরভাগ মেয়েদের বিবাহ হত কোন বৃদ্ধ কুলীনের সাথে। শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে কত মেয়ে বিবাহের প্রথম রাত্রেই মারা যেত।

বিয়ের পর সংসার ত্রৈলোক্যকে করতে হয়নি। বৃদ্ধ স্বামী ত্রৈলোক্যকে সংসারেও নিয়ে যায়নি। বেশিরভাগ কুলীন কন্যার মতো বিবাহের কিছু বছরের মধ্যেই ত্রৈলোক্য বিধবা হয়। কিন্তু বৈধব্য জ্বালা যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়নি সে নিজে স্বীকার করেছে-

> "আমি বিধবা হইলাম সত্য; কিন্তু হিন্দু-বিধবার ধর্ম্ম কিছুই আমাকে প্রতিপালন করিতে হইল না...।"[১]

শ্বশুর বাড়ির জ্বালা যন্ত্রনা বা সতীনের সঙ্গে সংসার কিছুই তাকে করতে হয়নি। বিবাহের পরেও সে বাবা-মায়ের সঙ্গেই থাকত। নিঃসঙ্গ জীবন ও বাবা মায়ের তিরস্কারের ফলস্বরূপ ঘনিষ্ঠতা বারে প্রতিবেশী বৈষ্ণবী তারাদিদির সাথে। এই তারাদিদির হাত ধরেই বিপথে প্রবেশ ত্রৈলোক্যর। দেবারতি মুখোপাধ্যায় 'রাঁড়-কাহিনি' গল্পে তারা দিদির সম্পর্কে বলেছেন-

> "তারা বৈষ্ণবী যে আসলে একজন পাকা দালালের মতো ত্রৈলোক্যকে ধীরে ধীরে পাপের পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য মধ্যস্থতার কাজ করছিল।"[২]

আসলে উনিশ শতকের এই বৈষ্ণবীদের সম্বন্ধে আমরা প্রায় সকলেই ওয়াকিবহাল। উনিশ শতকীয় সাহিত্য ঘাটলে এরকম বৈষ্ণবী সংখ্যা অনেক পাওয়া যাবে, যারা আসলে দূতীর কাজ করত। বয়স্কা বেশ্যারা তাদের যৌবন শেষে এই দূতীর কাজেই যোগদান করত। বলা যেতে পারে তারা বৈষ্ণবী ভালোবাসার ছলনার দ্বারা ভুলিয়ে ভালিয়ে, সাহায্যের কৌশলে ত্রৈলোক্য ও তার পরিবারকে হাতের মুঠোয় এনে ত্রৈলোক্যকে বিপথে নিয়ে যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 53
Website: https://tirj.org.in, Page No. 452 - 456
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উনিশ শতকের সাহিত্যে এই দূতীর ছবি বারবার ফুটে উঠেছে। সেকালে এই দূতীরা ভদ্র পরিবারের মেয়ে বউদের ভুলিয়ে বেপথে নিয়ে আসত। এই তারা দিদির সাহায্যেই সোনাগাছির এক যুবকের সাথে পরিচয় হয় ত্রৈলোক্যর। এই যুবকের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই তারাদিদি রতি বিষয়ক নানা কথা বলে ত্রৈলোক্যের মনকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। সেই কারণে, তারাদিদির পরিচিত সোনাগাছির যুবকের প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছিল ত্রৈলোক্য। সাক্ষাতের পর তারাদিদির গৃহেই চলে তাদের রাসলীলা। তারা বৈষ্ণবীর মৃত্যুর পর তার গৃহে সম্ভোগে মত্ত থাকা অবস্থায় ধরা পড়ে ত্রৈলোক্য এবং তার সেই প্রেমিক। প্রেমিক পুরুষের হাত ধরেই ঘর ছাড়ে ত্রৈলোক। সংসারের আশায় প্রেমিকের সাথে গৃহত্যাগ করে কলকাতার সোনাগাছিতে পৌঁছালো ত্রৈলোক্য। যদিও সংসারের স্বপ্ন তার কোনও দিনই মেটেনি। এই একজনকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেও তার রক্ষিতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গৃহিণী হতে পারেনি। সোনাগাছিতেই তার ঠাঁই হয়। গ্রাম থেকে আসা ত্রৈলোক্য প্রথমে এই পরিবেশের কিছুই বুঝতে পারেনি। সোনাগাছি তার কাছে এক অজানা প্রদেশ-

> "উহার ভিতর গমন করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা পূর্ব্বে আমি আর কখনও দেখি নাই, বা কাহারও নিকট শ্রবণ করি নাই।"[৩]

ধীরে ধীরে যখন সেই জায়গার বৈশিষ্ট্য বুঝতে শিখল তখন ফেরার সমস্ত পথ বন্ধ তাই এই পরিবেশের ঢলেই নিজেকে ঢলিয়ে নিতে হয়েছিল। সুন্দরী ত্রৈলোক্যর পরিচয় হয়েছিল রাঁড় ত্রৈলোক্য। এই ছিল পাপের সিঁড়ির প্রথম ধাপ। ঊর্ধ্বে উঠতে গিয়ে আরও অনেক সিঁড়ি ভাঙতে হয়েছিল তাকে।

এই বেশ্যা ত্রৈলোক্যই উনিশ শতকের বারাঙ্গনা মহল এবং বাংলাকে আতঙ্কিত করে রেখেছিল। তার প্রথম অপরাধ, তার কাছে আসা খরিদ্দারকে নেশায় চুর করে সমস্ত কিছু লুটে নেওয়া। যে কোনও কাজের পূর্বেই প্রয়োজন হয় পূর্ব পরিকল্পনার। ত্রৈলোক্যের এই সমস্ত অপরাধমূলক কাজের মাস্টারমাইন্ড ও সঙ্গী ছিল তার পরবর্তী প্রেমিক কালীবাবু। বারাঙ্গনা পেশায় প্রবেশের ১৫ বছর পর কালী বাবুর সঙ্গে ত্রৈলোক্যের সাক্ষাৎ। উনিশ শতকে নারী সমাজ পুরুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ত্রৈলোক্যের জীবনেও সেই ছাপ আমরা দেখতে পাই। প্রথমে বাবার অধীনে থাকাকালীন বৃদ্ধ এক কুলীনের সাথে বিবাহ। স্বামীর মৃত্যুর পর 'আর একজন' নামে চিহ্নিত ব্যক্তির হাত ধরে সোনাগাছি প্রবেশ এবং সেই একজনের মৃত্যুর বহু পর পরবর্তী প্রেমিক কালিনাথের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অপরাধ জগতে প্রবেশ। বলা যেতে পারে কালীবাবু তাকে হাত ধরে অপরাধের পথে নিয়ে আসে।

> "তাঁহারা ইচ্ছামত আমি সকল দুষ্কার্য্যই করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"[৪]

আসলে পাপের পথে ত্রৈলোক্য হয়েছিল কালীনাথের শাগরেদ। ত্রৈলোক্য, প্রেমের মোহে ভেসে তার বারাঙ্গনা জীবনের সঞ্চয় জলের মতো ছড়িয়েছিল। নিজের বিলাসিতা এমনকি কালীর পরিবারের খরচাও চলত তার উপার্জিত পয়সা থেকে। কথাই বলে বসে খেলে কুবেরের ধনও শেষ হয়। কালি ত্রৈলোক্যের জীবনে আসার পর ত্রৈলোক্য ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই সমস্ত বাবুদের উপেক্ষা করতে শুরু করে। কালী সর্বস্ব জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারিণীর। এদিকে কালী বাবুও চাকরিহীন, ত্রৈলোক্যের পয়সায় বিলাসিতা করা ছিল তার অভ্যাস। ফলে উপার্জিত অর্থের সমস্ত ভান্ডার শেষ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ালে দুর্নীতির রাস্তায় বেছে নিতে হয়েছিল তাদের জীবন চালানোর জন্য—

> "তখন তিনি আর কোন রূপ উপায় না দেখিয়া জুয়াচুরির নানা উপায় বাহির করিলেন এবং সেই উপায় অবলম্বনে আমাদের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হইতে লাগিল।"[৫]

এই জুটির প্রথম অপরাধ হল লুণ্ঠন। কালী বাবুর আনিত নব্য বাবুদের নেশায় আচ্ছন্ন করিয়ে বাবুদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করা হত। বেশ্যালয় আগত নব্য বাবুদের মদে ছাই মিশিয়ে প্রথমে তাদের অজ্ঞান করা হত এবং সমস্ত কিছু অপহরণ করে তাদেরকে বাড়ির বাইরে ফেলে দিয়ে আসত। নেশা কেটে গেলে কোনও কোনও নব্য বাবু পুলিশের কাছে গিয়ে নালিশ করত। কেউ কেউ সম্মানের ভয়ে বিষয়টা অপ্রকাশিত রেখে দিত। কারণ, বেশ্যালয়ে গিয়ে সম্পদ খুইয়ে আসা খুব একটা

সম্মানের বিষয় ছিল না। কিছুদিন পর সকলে এই বিষয়ে অবগত হয়ে গেলে তাদেরকে এই পন্থা বন্ধ করতে হয়, রোজকার বন্ধ হলে পুনরায় নকল সংসারে টান পড়তে শুরু করে।

বাড়ছে সংসার কিন্তু অর্থে যোগান বন্ধ তাই অপরাধ জগৎই তাদের ভরসা হয়ে ওঠে। অপরাধের প্রথম পথে বাধা এলে রোজকারের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার ছক কষতে শুরু করে এই জুটি। এবারের পরিকল্পনা জাল বিয়ে। গণেশ নামক এক ব্যক্তি তাদের সাথে এই পরিকল্পনায় যোগদান করে। বেশ্যা কন্যাকে শোত্রিয়ের কন্যা সাজিয়ে ভদ্র পরিবারের ছেলের সাথে বিয়ে দেওয়া হত। বিবাহের পর কন্যাকে পুনরায় মাতৃ গৃহে আনার নাম করে পয়সা ও অলংকার নিয়ে ফেরার হয়ে যেত তারা।

এই জুটির তৃতীয় অপরাধ ছিল কন্যা অপহরণ। অপহরণের কারণ ছিল কিন্তু সেই পুরনো অপরাধ জাল বিয়ে। বিধু নামক যে বেশ্যাকে শোত্রিয় কন্যা সাজিয়ে বিবাহ দেওয়া হত তার বয়স বেড়ে যাওয়ায় বালিকা চুরির রাস্তা বেছে নিতে হয়েছিল তাদের। অপহৃত বালিকাদের বিবাহ দিয়ে বরপক্ষকে বোকা বানিয়ে অলংকার অপহরণ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। যদিও পরে পুলিশের ভয় এই বৃত্তিটাও তাদেরকে বন্ধ করতে হয়েছিল।

এত অপরাধের পরও ধরা না পড়ায় সাহস বাড়ছিল এই জুটির এবং ছোট ছোট অপরাধ থেকে বড় অপরাধে যাওয়ার রাস্তা ক্রমশ পাকা হচ্ছিল। এতদিনের চুরি-জোচ্চুরি থেকে সরে এসে পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল মানুষ খুনের। খুন করেছিল গয়নার দোকানের এক কর্মীকে। এবারে তাদের রাস্তায় বাঁধা পড়ে, খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কালী বাবুর ফাঁসি হয়েছিল। কালীর মৃত্যুর পর আর্থিক দুরাবস্থার কারণে বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে কালী বাবুর পুত্র হরিকে নিয়ে খোলার ঘরে বসবাস শুরু করতে হয়েছিল ত্রৈলোক্যকে। পুনরায় ত্রৈলোক্যে দেহ ব্যবসাকে গ্রহণ করে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের জন্য। সেখানে তার খরিদ্দার ছিল- "নিত্যান্ত সামান্য ও দরিদ্র।"[৬]

যদিও কালী বাবুর মৃত্যুর পর অনেকদিন পর্যন্ত পাপ কাজ থেকে বিরত ছিল ত্রৈলোক্য। কিন্তু পাপ জীবন হাতছানি দিতে থাকে। পূর্ব পরিচিত গণিকাদের সঙ্গে পুনরায় পরিচয় ঝালিয়ে নিতে শুরু করে সে। মতলব ছিল অন্য, মাথায় তখন ঘুরছে নতুন পরিকল্পনা। এ যেন বাঘিনী বেরিয়েছে শিকারে, এবার সরাসরি ঘাড় মটকাবে শিকারের। অলৌকিক গুরুর কথা শুনিয়ে দুঃখী বঞ্চিত বারাঙ্গনাদের জালে ফাঁসানোই ছিল তার লক্ষ্য। এই গুরু বঁড়শির প্রথম টোপ গিলে ছিল কুসুম নামের এক গণিকা। দুঃখী, উপেক্ষিত কুসুম নিজের বাবুকে ফিরে পেতে এবং হারানো অর্থ দ্বিগুণ করার লোভ সামলাতে না পেরে ত্রৈলোক্যর জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। কী দারুন জাল বিস্তারের ক্ষমতা ত্রৈলোক্যর! সরলা কুসুম ত্রৈলোক্যের গুরু দর্শনের প্রস্তাবে রাজি হলে ত্রৈলোক্য সারারাত ধরে তাকে মারবার ছক সাজাতে থাকে। পরদিন পরিকল্পনা মফিক জলে ডুবিয়ে কুসুমকে হত্যা করে এবং তার গয়নাগুলো নিজের কবলিত করে পালিয়ে আসে। পাপের রাস্তায় সে এতটাই পাকা হয়ে উঠেছে যে পুনরায় মানুষ খুন করতে তার হাত কাঁপেনি একবারের জন্যও।

কুসুমকে খুন করার পরও ধরা না পড়ায় বাড়তে থাকে তার সাহস। পুনরায় ছক কষে খুনের। এই সময়ে তার চেলা হয় বাকশক্তিহীন এক মেয়ে, নাম তার খুঙ্গি। পুনরায় সে দুঃখী, উপেক্ষিতা বারাঙ্গনাদের ফাঁদে ফেলতে শুরু করে এবং গুরুদেবকে দর্শন করানোর বাহানায় মানিকতলার পরিত্যক্ত এক বাগানে তাদের নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারতে থাকে। একটা বিষয় আমরা দেখতে পাই, গয়নার লোভ শুধু ত্রৈলোক্যর একার ছিল এমন নয়; লোভ তাদেরও ছিল যাদেরকে সে শিকার বানিয়ে নিয়ে যেত। গয়নার পরিমাণ দ্বিগুণ করার জন্য শিকারি ত্রৈলোক্যের শিকাররা গা ভর্তি গয়না পড়ে যেত। এ জগতে লোভ সকলেরই; সকলেই তার সম্পদকে দ্বিগুণ করতে চায়। বাগান বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর ধর্মীয় আচারের ছুতোয় গুরুর দর্শন পূর্বে স্নান করার নির্দেশ দিতো ত্রৈলোক্যতারিণী। এরপর সেই স্নানরতা মেয়েদেরকে ডুবিয়ে মারত ত্রৈলোক্য এবং স্নানের পূর্বে খুলে আসা গয়নাগুলোকে আত্মসাৎ করে পালাত। বাকশক্তিহীনা সঙ্গীর সাহায্যে তিন বছরে সে পাঁচ-পাচটি স্ত্রী হত্যা করেছিল। কিন্তু ষষ্ঠ শিকারের সময় দেবতা ত্রৈলোক্যর সহায় ছিলেন না, কথায় আছে পাপ থাকে না চাপা। এই সক্রিয় অপরাধী তার ষষ্ঠ শিকারকে ডোবানোর চেষ্টা করতে যাওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে। পূর্বের পন্থা অবলম্বন করে এক বারবনিতাকে নিয়ে এসে ডুবিয়ে হত্যা করার সময় সেই পথে গমনকারী এক যাত্রী তাকে দেখতে পেয়ে থানায় ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শী বা ভিকটিমের কথায় বিশ্বাস না করে ত্রৈলোক্যকে মুক্তি দেন। যদিও সন্তুষ্ট

না হয়ে বাদিরা মামলাটি প্রিয়নাথের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু এবারেও ত্রৈলোক্য মুক্তি পেয়ে যায়। নিজেকে শুধরে নেওয়ার অনেক সুযোগ ত্রৈলোক্য পেয়েছিল কিন্তু পাপকার্যে অভ্যস্ত ত্রৈলোক্য এসব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি।

এই সমস্ত ঘটনা প্রচারের কারণে পুনরায় স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল ত্রৈলোক্যকে। জীবনের শেষ ঠিকানা হয়েছিল চিৎপুরের পাঁচু ধোপানির গুলির একখানি ঘর। সেখানে তার পরিচয় হয় প্রিয় নামের এক বেশ্যার সঙ্গে, তার জীবনের শেষ অপরাধের সঙ্গী হয়েছিল এই প্রিয়। এই পাঁচু ধোপানির গলিতে তার টার্গেট ছিল রাজকুমারী নামের এক বেশ্যা। প্রিয়র সাহায্যে রাজকুমারীকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে তার প্রচুর গয়না ছিনিয়ে নিয়েছিল ত্রৈলোক্য। এটাই ছিল তার জীবনের শেষ খুন, শেষ অপরাধ। একের পর এক খুনের পরেও দৈবের কৃপায় মুক্তি পেতে থাকে ত্রৈলোক্য। অবশেষে ধরা পড়ে রাজকুমারীকে হত্যার অপরাধে। অবশেষে ১৮৮৪ সালে ৩ সেপ্টেম্বর ত্রৈলোক্যকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। যদিও সে এই অপরাধ প্রথমে স্বীকার করেনি, পূর্বের মতো অস্বীকার করে গেছে কিন্তু দারোগা প্রিয়নাথ হাল ছাড়লেন না। চালাকির সাহায্যে তাকে ফাঁসালেন। এবার ত্রৈলোক্যকে ধরতে জালটা বিছিয়ে ছিল দারোগা প্রিয়নাথ। দারোগা প্রিয়নাথ রাজকুমারী খুনের সমস্ত দোষ চাপায় হরির ঘাড়ে। প্রাণপ্রিয় পালিত পুত্র হরিকে খুনের দায়ে ফাঁসানো হচ্ছে দেখে নিজেই সমস্ত অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল এই পেশাদারি খুনি। তার এই স্বীকারোক্তিই তাকে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তার অপরাধ জগতের ইতি এখানেই। ১৮৮৪ সালে এই ত্রৈলোক্যের ফাঁসি হয়। এতগুলো খুন করতে যে ত্রৈলোক্যের হাত একবারের জন্যও কাঁপেনি সেই ত্রৈলোক্যের প্রাণ কেঁপেছিল পালিত পুত্র হরির জেলে যাবার কথা শুনে। হরিকে সে প্রাণাধিক ভালোবাসত। তাই হরি ফাঁসছে দেখে নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেয়।

পূর্বে উল্লেখিত সমস্ত কথা ত্রৈলোক্যই দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়কে জানিয়েছে। হয়তো "মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এটা জেনে ত্রৈলোক্য তাঁর অন্তিম স্বীকারোক্তি রেখেযাচ্ছিলেন।"[৭] এই সমস্ত কথা অজানা থেকে যেত যদি না প্রিয়নাথ বাবু দারোগাগিরির পাশে কলম ধরতেন; অজানা থেকে যেতে বর্তমানে প্রত্যন্ত গ্রামের কুলিন বংশের কন্যা থেকে দাগি আসামি হয়ে ওঠা এক মেয়ের কথা; অধরা থেকে যেত ত্রৈলোক্যর অন্ধকার জীবনের কথা, বাল্যকালে কুপ্রথার শিকার হয়ে অজানা ইতর রাজ্যে প্রবেশের কথা; অজানা থেকে যেত প্রথম বাঙালি পেশাদারী মহিলা খুনির কথা, ভারতের জ্যাক দি রিপারের কথা; অজানা থেকে যেত হত্যার অপরাধে ভারতবর্ষের প্রথম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মহিলার কথা। কালের স্রোতে হারিয়ে যেত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির ত্রাস, ত্রৈলোক্যতারিণী।

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ, 'দারোগার দপ্তর-৩', পুনশ্চ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০২১, পৃ. ২৩০
২. মুখোপাধ্যায় দেবারতি, 'বাবু ও বারবনিতা', দীপ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, 201৯, পৃ. ২৪
৩. মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ, 'দারোগার দপ্তর-৩', পুনশ্চ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০২১, পৃ. ২৩৪
৪. মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ, 'দারোগার দপ্তর-৩', পুনশ্চ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০২১, পৃ. ২৩৮
৫. তদেব, পৃ. ২৩৮
৬. তদেব, পৃ. ২৪৭
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, 'অশ্রুত কণ্ঠস্বর', সুবর্ণরেখা পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জাবুয়ারি, ২০০২, পৃ. ৭৪